\\storage\Advertisement\2020\16.03.2020\Mujib 100

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

আজ ১৭ মার্চ, বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এ বছর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি এই মহান নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। বছরজুড়ে দেশ-বিদেশে সাড়ম্বরে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছে। জন্মশতবার্ষিকীর এই বর্ণাঢ্য আয়োজন যথাযথ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে উদ্‌যাপনের জন্য আমি দেশবাসী ও প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী'র সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ১৯৪৮ সালে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', '৫২ এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে World's Documentary Heritage-এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ ভাষণের কারণে বিশ্বখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে 'Poet of Politics' হিসেবে অভিহিত করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা"। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। মিত্রবাহিনীর সদস্যদের দেশে প্রত্যাবর্তন, স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের সংবিধান রচনা, জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ, সকল স্তরে দুর্নীতি নির্মূল, কৃষিবিপ্লব, কলকারখানাকে রাষ্ট্রীয়করণসহ দেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবার হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি।

রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' সহ তাঁর উপর লিখিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আগামীতে জাতিগঠনে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক, গড়ে উঠুক সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব- এ প্রত্যাশা করি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করাই হোক মুজিববর্ষে সকলের অঙ্গীকার।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে সকল শিশুসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শহিদদের।

এবারের জাতীয় শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য "মুজিববর্ষে সোনার বাংলা, ছড়ায় নতুন স্বপ্নাবেশ; শিশুর হাসি আনবে বয়ে, আলোর পরিবেশ"। জাতির পিতার জীবন ও কর্ম আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়কে 'মুজিববর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের পাশাপাশি ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে 'মুজিববর্ষ'।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আমরা এ দিনটিকে "জাতীয় শিশু দিবস" ঘোষণা করেছি।

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অপরিসীম মমতা। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, অমিত সাহসী, মানবদরদী এবং পরোপকারী। ছিলেন রাজনীতি ও অধিকার সচেতন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্বনেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা; ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করা। স্কুলে পড়ার সময়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ লাভ করতে থাকে। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেন বাংলার নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল। ১৯৪৮-৫২'র ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা, '৬৮-র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন এবং '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ জাতির পিতার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু যখন 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের প্রায় সকল সদস্যসহ নৃশংসভাবে হত্যা করে। দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন। বর্তমান সরকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশু আইন-২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশু দিবস উদ্‌যাপন, সুবিধাবঞ্চিত পথ শিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার প্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাস ভূমিতে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছি। শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলার বিভিন্ন শাখায় শিশুদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করার মধ্যদিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে মাতা-পিতা, পরিবার ও সামাজের ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ এবং সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধ করার জন্যে আজকের এদিনে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রত্যয়ে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব শিশুদের কল্যাণে আমরা বর্তমানকে উৎসর্গ করি। সবাই মিলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য ও আগামীদিনের কর্ণধার শিশু-কিশোরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

১০ জানুয়ারি ১৯৭২: স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তন

ঐ মহামানব আসে

রফিকুল ইসলাম

জাতীয় অধ্যাপক

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় দিন ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, যেদিন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ বংশে জন্ম নিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান নামে এক শিশু। সেদিন কে জানত যে এই শিশুই একদিন বড়ো হয়ে যুগ যুগ ধরে পরাধীন বাংলার মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধু রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। প্রসঙ্গক্রমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৪১ সালে রচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি যে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন তার যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন: "পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই"। প্রবন্ধটি তিনি শেষ করেছেন এই কবিতাটি দিয়ে:

ঐ মহামানব আসে,
দিকে, দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।

... ...
জয় জয় জয়রে মানব-অভ্যুদয়'

রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যতবাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল যখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন জাতি ও ভাষা রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল ১৯৭১ এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে।

শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরে স্কুল জীবন এবং কলকাতায় কলেজ জীবন শেষে ১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন, '৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এই সময় থেকেই তাঁর সুদীর্ঘ কারাজীবনের সূচনা। '৪৯ সালে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার ও গ্রেফতার হন, যা চলেছিল ১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের ভাষা আন্দোলনের সময় পর্যন্ত।

বস্তুতপক্ষে, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত তিনি বারবার আন্দোলন, কারাবরণ, অনশনের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রথম ৫ বছরের মধ্যে ৪ বছর অতিবাহিত করেন। এরই মধ্যে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৪৯ সালে কারাগারে বন্দি অবস্থাতেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে ২১ দফার ভিত্তিতে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলীম লীগকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু সে সরকার দুই মাসের বেশি টেকেনি। ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। যার নেপথ্য নায়ক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, তখন তাঁকে দেখি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রূপে।

১৯৫৫ সালে তিনি পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ সরকার এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। তিনি আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান দুই ইউনিটে পরিণত হয় এবং পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লোপ পায়। প্রতিবাদ স্বরূপ শেখ মুজিবুর রহমান এই সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। প্রথমে জেনারেল ইসকান্দার মির্জা এবং পরে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক হন। এই সময় থেকে এক দশকের উপর পাকিস্তানে সামরিক শাসন চলতে থাকে। ১৯৫৮ সালে শেখ মুজিব গ্রেফতার হন। ইতোপূর্বে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। পূর্ব বাংলার দুর্ভাগ্য যে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে প্রথমে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করেন। তখন পূর্ব বাংলায় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অন্য কোন রাজনীতিবিদ ছিলেন না। ১৯৬৪ সালে গভর্ণর মোনায়েম খানের আমলে পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে "পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও" নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রতিরক্ষা বিষয়ে পূর্ববাংলা সম্পূর্ণ অরক্ষিত। এই প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। যার মাধ্যমে পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেশনে পরিণত করার পরিকল্পনা ছিল। শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর থেকে বার বার গ্রেফতার করা হতে থাকে। তাঁকে ১৯৫৮ সালে গ্রফতার করে ১৯৫৯ সালে মুক্তি দিয়ে আবার জেলগেট থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯৬০-এর সেপ্টেম্বরে ২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে পুনরায় ১৯৬২ এর ২ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৪ সালে তিনি আবার গ্রেফতার হন। তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও জননিরাপত্তা আইনে তাঁকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালে তিনি যে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ:

সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার; প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ছাড়া সকল ক্ষমতা প্রদেশের; পূর্ব ও পশ্চিমাংশের জন্য পৃথক মুদ্রা; প্রদেশের রাজস্ব ও কর আদায়ের ক্ষমতা; প্রদেশকে পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্য চালানো ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের অধিকার এবং প্রদেশের আঞ্চলিক সেনাবাহিনী বা আধা সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদান।

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সহসভাপতি ও তাজউদ্দিন আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এই নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। শেখ মুজিব ৬ দফার পক্ষে জনসভা শুরু করেন। প্রথমে খুলনা থেকে ফেরার পথে যশোরে গ্রেফতার ও জামিন। ৭ মে নারায়ণগঞ্জ থেকে আসার সময় গ্রেফতার। তাঁকে দেশরক্ষা আইনে ৩ মাসের আটকাদেশ দিয়ে ঢাকা জেলে বন্দি করা হয়। ৭ জুন ব্যাপক হরতালে মনুমিয়াসহ সমগ্রদেশে ১১জন নিহত হয়। ১৯৬৭ সালে আপত্তিকর ভাষণের দায়ে শেখ মুজিবকে ১ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ১৯৬৮ সালে নববর্ষের প্রথম দিনই 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকের বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ২১ এপ্রিল বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে ঢাকা সেনানিবাসে বিচার কার্য শুরু হয়।

১৯৬৯ এর ১৮ জানুয়ারি থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিছিল হয়। ২০ তারিখে আসাদের ও ২৪ তারিখে মতিউরের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে। আন্দোলন 'গণঅভ্যুত্থানে' রূপান্তরিত হয়। ঢাকায় ২৫ জানুয়ারি থেকে কারফিউ জারী করা হয়। শেখ মুজিবের মুক্তি ও 'আগরতলা মামলা' প্রত্যাহারের দাবিতে সারাদেশ উত্তাল হয়ে উঠে। ১৫ ফেব্রুয়ারি মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা সেনাবাহিনীর হাতে শহিদ হলে বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির বিস্ফোরণ ঘটে। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে কারফিউ ও ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল বন্দিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সামরিক প্রশাসন। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৯ এর ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন। সামরিক শাসন জারী, সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করে সামরিক শাসন জারী করেন এবং ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক নিয়ে ৩০০ সাধারণ আসনের মধ্যে ১৬২ আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদের ২৯৮ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮ আসন পায়।

১৯৫৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে বঙ্গবন্ধু

১৯৭১ এর ১ মার্চ বেতার ভাষণের মাধ্যমে আসন্ন গণপরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ২, ৩ মার্চ দেশব্যাপি হরতাল। বঙ্গবন্ধুর ডাকে এক অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ পল্টনে বঙ্গবন্ধুর সভায় আমার সোনার বাংলা জাতীয় সংগীত হিসাবে ঘোষিত হয়। রেসকোর্সের জনসমুদ্রে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে শত্রুর মোকাবিলায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার এবং 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম–এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণা দেন। ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত একদিকে অসহযোগ আন্দোলন অন্যদিকে পাকিস্তানের সামরিক অভিযান ও গণহত্যার প্রস্তুতি চলতে থাকে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার প্রহসন চালাতে থাকেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

২৫ মার্চ অপরাহ্নে ইয়াহিয়া খান পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযান ও গণহত্যার নির্দেশনা দিয়ে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো তাকে অনুসরণ করেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ২৫ মার্চ মধ্য রাতের আগেই সামরিক অভিযান ও গণহত্যা শুরু করে। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে (১২:২০ মি) বঙ্গবন্ধু ইপিআর এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যায় এবং ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাত থেকে বাংলাদেশে সামরিক অভিযান, গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে শুরু করে। বাঙালি রুখে দাঁড়ায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে। ১ কোটির অধিক শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। অপরদিকে পাকিস্তানি কারাগারে সামরিক আদালতে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুর বিচারকার্য সমাপ্ত করে বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সুপারিশ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে প্রেরিত হয়। ইয়াহিয়া খান সেই মৃত্যুদণ্ডাদেশে স্বাক্ষর করার আগেই বাংলাদেশে যুদ্ধরত ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ঢাকায় ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে রেসকোর্স ময়দানে মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। ইয়াহিয়ার পতন ঘটে। জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত এবং তিনি আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিণ্ডি থেকে করাচি বিমান বন্দর হয়ে লণ্ডনে গমন করেন। এরপর নয়াদিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। দিল্লিতে তাকে অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বঙ্গবন্ধু ঢাকায় এসে ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন এবং ১৯৭১ সালে ৭ মার্চের বক্তৃতায় তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের ঘোষণা দেন। ওই সভাতেই আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের সব দিকনির্দেশনা দিয়ে যান। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দৈহিকভাবে উপস্থিত না থাকলেও তার দিকনির্দেশনাতেই পরিচালিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে তিনি ১৯৭১ সালের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে বজ্রকণ্ঠ অনুষ্ঠানে প্রতিদিন বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ ও নির্দেশনা বাঙালির চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং ৭১ এর যুদ্ধে ধ্বংসস্তূপে পরিণত বাংলাদেশের পুনর্বাসনের কাজটি সম্পন্ন করেন। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। যুদ্ধাহত ও বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রদান করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ে সমর্থ হন। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান এবং বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর অবদান সুগভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধু সপরিবারে আত্মহুতি দিয়ে গেছেন, যে ঋণ এ দেশ ও জাতি কোনদিন পরিশোধ করতে পারবে না। আমরা ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহিদ সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। ❑

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ

লক্ষ শিশুর প্রেরণার দিন

সেলিনা হোসেন

১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস। এ বছর এই দিনে উদ্‌যাপিত হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শতবর্ষের জন্মদিন। এই জন্মদিন লক্ষ শিশুর মানবিক চেতনায় শুভবোধ নিয়ে গড়ে ওঠার প্রতীকী দিন। জাতির পিতা, স্বাধীনতার স্থপতি, ইতিহাসের মহামানবের ত্যাগ, সাহস এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা নিয়ে বড়ো হবে শিশুরা। শুভবোধের চেতনায় আলোকিত রাখবে নিজেদের শিক্ষার নানা দিকের সবটুকু ধারণ করে। মানুষ হবে দেশের প্রকৃত ইতিহাস জেনে। অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে সেই ইতিহাস ও চেতনাকে সঠিকভাবে রক্ষা করার প্রেরণায়। দেশ, জাতি, মানুষ সংক্রান্ত ভাবনায় জাতির পিতার জন্মদিন এ দেশের শিশুদের বেড়ে ওঠার বিকাশে একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ দিন।

শৈশব থেকেই তাঁর মানস চেতনায় দুটো জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এক. মানুষের প্রতি ভালোবাসা। দুই. অধিকার আদায়ের সচেতনতা। স্কুল থেকে ফেরার পথে তিনি শীতে কাঁপতে থাকা বুড়োকে গায়ের চাদর খুলে দিয়েছিলেন। বর্ষাকালে গরিব বন্ধুটি ভিজে স্কুলে এসেছিল দেখে নিজের নতুন ছাতাটি বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছিলেন। শৈশব থেকে এভাবে নিজস্ব আলোকে মানুষের অবস্থা বুঝতে শিখেছিলেন। মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনকে সম্মান করতে শিখেছিলেন। আজকের বাংলাদেশের শিশুদের এই মানবিক বোধ সম্পন্ন হয়ে বড়ো হয়ে ওঠা খুব জরুরি। তাই মহৎ মানুষের জীবনটিকে সামনে রেখে তাদের নৈতিকবোধে গড়ে তোলা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৪ জানুয়ারি রমনা রেসকোর্সে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে উল্লেখ করেছিলেন : 'বাংলার মানুষ বিশেষ করে ছাত্র এবং তরুণ সম্প্রদায়কে আমাদের ইতিহাস এবং অতীত জানতে হবে। বাংলার যে ছেলে তার অতীত বংশধরদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারেনা সে ছেলে সত্যিকারের বাঙালি হতে পারে না। আজও বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়নি। নতুন করে বাঙালির ইতিহাস রচনা করার জন্য দেশের শিক্ষাবিদদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। এই ইতিহাস পাঠ করে যেন বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধররা তাদের গৌরবময় অতীতের পরিচয় পেয়ে গর্ব অনুভব করতে পারে এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে'।

গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলে পড়তেন তিনি। একবার স্কুল পরিদর্শনে আসেন শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ মন্ত্রী দুজন পরিদর্শন শেষে চলে যাওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু কয়েক জন ছাত্রসহ তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। বলেন, বৃষ্টির সময় স্কুলের হোস্টেলের ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়ে। ফলে ছাত্রদের অসুবিধা হয়। পড়াশোনায় ব্যাঘাত হয়। তাঁরা দুজনই স্কুল ছাত্রের সাহসী ভূমিকা দেখে খুশি হন। অধিকার আদায়ের জন্য দৃঢ়চিত্ত হওয়া যে জরুরি তা তিনি সেই বয়সেই বুঝেছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই সাহসকে অভিনন্দন জানান। নিজস্ব তহবিল থেকে হোস্টেলের ছাদ মেরামতের প্রয়োজনীয় টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। দুজন মানুষই স্কুলের ছাত্রের ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হন। বুঝতে পারেন যে অধিকার আদায়ের পক্ষে নির্ভীক, সে অনেক দূর যাবে।

১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এইজন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।

আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সহিত শহিদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবেন। ইহা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকা কালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হইয়াছে'।

তাঁর সাহস, শিক্ষা, জ্ঞানবুদ্ধি, মেধা দিয়ে টুঙ্গিপাড়ার মতো বাংলাদেশের একটি গ্রাম থেকে বিশ্বের সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছে ছিলেন, একটি স্বাধীন দেশের স্থপতি এবং জাতির পিতার গৌরব নিয়ে। তাঁর জন্মদিন শিশুদের জন্য জাতীয় শিশুদিবস। এটি শুধু একটি দিন মাত্র নয়। সেই মানুষটি সম্পর্কে জানতে হবে শিশুদেরকে। জানতে হবে কীভাবে তিনি দেশ ও দেশের মানুষকে শৈশব থেকে জানতে শিখেছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৭ মার্চ গণভবনে শিশুদের মাঝে

১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম বিশ্ব শিশুদিবস পালিত হয়। আয়োজক ছিল ইউনিসেফ ও আন্তর্জাতিক শিশু কল্যাণ ইউনিয়ন। এখন অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশুদিবস হিসেবে পালিত হয়। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অসংখ্য শিশু এতিম হয়ে পড়ে। হারায় আশ্রয়, বেঁচে থাকার নিরাপত্তা। ১৯২৪ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয় লীগ অব নেশনস্-এর কনভেনশন। সেই কনভেনশনে ঘোষণা করা হয়, মানব জাতির সর্বোত্তম যা কিছু দেবার আছে, শিশুরাই তা পাওয়ার যোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আবার লক্ষ লক্ষ শিশু এতিম ও অসহায় হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, পারমানবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তায় অসংখ্য শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ শিশু অধিকার বিষয়ক সনদটি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হয়। সনদে স্বাক্ষর দাতা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছিল অন্যতম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ।

একথা সত্যি বিশ্ব শিশুদিবস শিশুদেরকে আন্তর্জাতিক চেতনা বিকাশে সহায়তা দেয়। আর জাতীয় শিশু দিবস শিশুদেরকে নিজের জাতিসত্তায় বিকশিত করে। তাকে ঐতিহ্য বুঝতে শেখায়। তার সংস্কৃতিকে লালন করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। যে কোনো শিশু পৃথিবীর যে দেশেই থাকুক না কেন তাকে নিজের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়েই মাথা তুলে থাকতে হয়। এই দিক বিবেচনা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা।

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে তিনি স্কুলের বালিকাদের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি নিজের সুদূরপ্রসারী চিন্তায় একটি বিশাল লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। একজন রাজনৈতিক নেতা কত দূরদর্শী সম্পন্ন হন বঙ্গবন্ধুর এই ভাবনা শিশুসম্পর্কিত চিন্তাকে মহীয়ান করে। তিনি সে সময় ঢাকার কারাগারে রাজবন্দি ছিলেন। বইয়ের ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিল, তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। তিনতলা দালান। দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হত না। 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই', 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না'- নানা ধরনের স্লোগান। এই সময় শামসুল হক সাহেবকে আমি বললাম, "হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা না করে পারবে না"। হক সাহেব আমাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, মুজিব"।

বালিকাদের স্লোগান দেওয়াকে তিনি কত মর্যাদার সঙ্গে দেখেছেন এটি তার চেতনার বড়ো দিক। শিশুরাও তাঁর কাছে ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রবল শক্তি। মনে করেননি ওরা যা করছে তা দিয়ে কিছু হবে না। এভাবেই বঙ্গবন্ধু তাঁর চিন্তা-চেতনায় দেশবাসীর প্রতিটি জায়গাকে মূল্যায়ন করেছেন। এটিই তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের বড়ো দিক।

তিনি তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের শুরুতে লিখেছেন : 'একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে'।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের দিনটি শুধু একটি মাত্র দিন নয়, তরুণ প্রজন্মের মানবিক শিক্ষায় একটি বড়ো দিক, নিজেদের জীবনযাপনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ চর্চা করলে নিজেদের শাণিত করা যাবে। এই শিক্ষা নিয়ে বড়ো হোক এই প্রজন্ম।

লেখক : কথাসাহিত্যিক ❑

Ode to a Leader

নির্মলেন্দু গুণ

'আমি জন্মদিন পালন করিনা,'
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
১৭ মার্চ ১৯৭১।

তিনি তাঁর জন্মদিন পালন করতেন না।
জন্মদিন পালন করাকে তিনি সময়ের
অপচয় বলে মনে করতেন।

তিনি ভাবতেন, সময় নষ্ট করার মতো সময় তাঁর নেই।
তিনি তো জানতেন, সন্ধ্যে নামবার আগেই
তাঁকে পৌঁছুতে হবে তাঁর গন্তব্যে।
এবং আমরা, আমরা যারা তাঁর অনুসারী ছিলাম-
জানতাম, ১৯৬৬ সনের ৫ ফেব্রুয়ারি থেকেই জানতাম,
তাঁর গন্তব্য কোথায়।

নরক থেকে মুক্তির আশায় প্রহর গুনছিল যে-জন্মভূমি,
সেই জন্মভূমির স্বাধীনতার সঙ্গে অভিন্ন বন্ধনে
তিনি গেঁথে নিয়েছিলেন তাঁর নিজের জন্মদিনটিকে।

তিনি তাঁর জন্মদিন পালন করতেন না বলেই,
তাঁর পক্ষে, তাঁর জন্মভূমিকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

তিনি তাঁর জন্মদিন পালন করতেন না বলেই--
বাংলাদেশের মানুষ আজ
তাঁর জন্মশতবর্ষ পালন করছে 'মুজিববর্ষ'-রূপে।

জন্মদিন পালন না করে,
জন্মভূমির মুক্তির জন্য
তিনি যে সময় বাঁচাতেন--
আমরা তা না বুঝলেও
তার অর্থ ঠিকই বুঝেছিল
বাংলার নদী, মাটি, গাছ।

তিনি তাঁর জন্মদিন পালন করতেন না বলেই--
আজ গাছে-গাছে নবপত্র দল
বসন্ত বাতাসে দুলছে।
প্রতিটি নদীর তীরে তীরে
মহানন্দে দোলখাচ্ছে ফিঙে পাখিরা।

আপনি মুক্তির যে-গান আমাদের শুনিয়েছিলেন,
সেইগান বাংলার আকাশ ছাড়িয়ে,
আজ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের আকাশে।

আমি কোটি মানুষের কৃতজ্ঞ চোখের অশ্রু,
প্রাণের আনন্দ ও বেদনার দীর্ঘশ্বাস দিয়ে
আপনার উদ্দেশে এই মহিমা গান রচনা করেছি।

এই শব্দব্রহ্মজ্যোতির অর্ঘ্য
আপনি গ্রহণ করুন, পিতা।

অনন্ত মুজিব জন্ম

মুহম্মদ নূরুল হুদা

মুহূর্তে মুহূর্তে তুমি জন্ম নাও তোমার ভিতর,
মুহূর্তে মুহূর্তে তুমি জন্ম নাও আমার ভিতর;
মুহূর্তে অনন্ত জন্ম, এই মাটি অমরা বাসর;
বাঙালি মুজিব জাতি, চিরবাংলা মুজিবের ঘর।

কে বলে তোমার জন্ম এই বঙ্গে শুধু শতবর্ষ আগে?
কে বলে তোমার জন্ম থেমে গেছে ঘাতক মৃত্যুতে?
তুমি আছো স্বর্গে-মর্তে উদয়াস্ত অভ্র অনুরাগে,
পলে পলে পল্লবিত, সর্বভূ-তে, সব ফলন্ত ঋতুতে।

জলেস্থলে অন্তরীক্ষে যে-মুহূর্তে বিশ্ব-মন-মাটি
ত্রিভুবন ঘুরে এসে মিশে গেছে খড়ো বঙ্গনীড়ে,
গণবাঙালির সেই স্বর্গাদপি আদিমাটি, পরিপাটি,
ধারণ করেছে এক বিশ্ব-ভ্রূণ, এই মধু-গঙ্গা তীরে;

অনন্তর অন্তরঙ্গে বাঙালির স্বাধীনতা, সাম্য, সদাচার;
সর্ব-অঙ্গে সর্বপ্রাণে বাঙালি, মানুষ আর প্রাণী একাকার;
প্রমিত স্বরূপ তার প্রমূর্ত বিমূর্ততার, সর্বমানবিকতার;
মানুষ, বাঙালি আর জাতিমৈত্রী: উৎসে শুধু শুদ্ধাচার।

অনন্তর জাতি বাঙালির বুকে মানবিক জনক উদগ্রীব,
অনন্তর অনন্তজন্মের বুকে নৈয়ায়িক জনক মুজিব।

আবার দেখা হবে

কামাল চৌধুরী

আবার দেখা হবে টুঙ্গিপাড়ায়
গিমাডাঙা স্কুলে, ফুটবল মাঠে
মধুমতি, বাইগারের জলে, দুরন্ত বালকের স্মৃতির সকালে
প্রতিদিন সূর্যোদয়ে, প্রতিদিন আগত সন্ধ্যায়—

বাংলাদেশ, আমি নত হয়ে বসে থাকি পদতলে
স্বাধীনতা, আমি পতাকার নিচে অসমাপ্ত জীবনী পাঠক
তোমার সমাধিসৌধে অনন্ত প্রার্থনা হাতে রেখেছি গোলাপগুচ্ছ
এত লাল! রক্তাক্ত হাতে হাতে ভেসে যাচ্ছে পদ্মা মেঘনা যমুনায়—
অবগাহন শেষে দেখা হবে শরীর ভেজা রোদে
যেখানে আমার দেশ সমাহিত মহিমায় খুঁজছে তোমাকে।

আবার দেখা হবে টুঙ্গিপাড়ায়
আশ্চর্য শব্দের গায়ে ঝরে পড়ছে ফোটা ফোটা বিনম্র আকাশ
সেখানে প্রতিদিন তোমাকে লিখছে বাংলা কবিতা
মহাদেশ পাড়ি দিচ্ছে তোমার মুক্তির মন্ত্র, জাতিরাষ্ট্র, জাগরণ,
বাঙালির ভোর।

০২.
আবার দেখা হবে রেসকোর্স ময়দানে
স্কুল পড়ুয়া বালকের রাগী বিকেলের রোদে
জনস্রোতে, লক্ষ লক্ষ মানুষের চিৎকারে, স্লোগানে
ইতিহাস বদলে দেওয়া তর্জনীর পাশে
অপরাহ্নের রক্তপলাশে
প্রতিটি প্রদীপ্ত উচ্চারণে
প্রতিটি মুক্তির শব্দে, স্বাধীনতায়।

আবার দেখা হবে রেসকোর্স ময়দানে
যখন উত্থিত হাত আমাদের সাহসী যৌবন
যার যা আছে তাই নিয়ে যখন নিরস্ত্র মানুষ
দাঁড়িয়ে পড়েছে হত্যাকারীর মুখোমুখি
যখন মাঠের শপথ ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে
যখন ইতিহাসের পাতায় পাতায়
গর্জে উঠছে শিমুলের লাল
যখন বজ্রকণ্ঠে কথা বলছে চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইল
সাতকোটি জীবিত সন্তান;
কথা বলছে বাংলাদেশ
কথা বলছে শেখ মুজিব
কথা বলছে সার্বভৌম জাতির পতাকা।

আবার দেখা হবে টুঙ্গিপাড়ায়, দেখা হবে রেসকোর্স ময়দানে।

একটি মানুষ যখন একটি দেশ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আজ থেকে ঠিক একশত বছর আগে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে মায়ের কোল আলো করে একটি শিশুর জন্ম হয়। কেউ তখনও জানত না প্রায় অর্ধশতাব্দী পর এই শিশুটি এবং একটি দেশ সমার্থক হয়ে যাবে–তিনি হবেন বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের স্থপতি, একজন রাষ্ট্রনায়ক এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর জীবনের মতো বর্ণাঢ্য, ঘটনাবহুল, বৈচিত্র্যময় এবং অবিশ্বাস্য জীবন কাহিনী এই পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। একদিকে তিনি ছিলেন প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী একজন রাজনীতিবিদ, একজন নেতা এবং সংগঠক, অন্যদিকে তিনি ছিলেন এই দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কাছাকাছি একজন মাটির মানুষ। সারা পৃথিবীর মানুষ এখন জানে, কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি ছাড়া লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে, তাদের মুখের ভাষায় কথা বলে মাত্র আঠারো মিনিটের একটি ভাষণে তিনি একটি দেশের গতিপথ নির্ধারণ করে দিতে পারেন।

তরুণ বয়সে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন রাজনীতি শুরু করেছিলেন তখন এই উপমহাদেশে রাজনীতির সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র ছিল ধর্ম। সময়টি ছিল ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদের সময়, হানাহানি এবং রক্তপাতের সময়। এই কলুষিত দুঃসময়েও বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিস্ময়করভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্ম পরিচয় নয়–মানুষ পরিচয়টিই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো। তাই ৪৬ সনের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় তিনি হিন্দু এবং মুসলমানদের সমানভাবে রক্ষা করেছেন, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় লঙ্গরখানা খুলে সকল ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন জুগিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম পরিবর্তন করে সকল ধর্মের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য 'আওয়ামী লীগ' নামকরণ করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানেরও একটি মূল আদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে যখন আবার ধর্ম নিয়ে হানাহানি শুরু হয়েছে তখন সবাই বঙ্গবন্ধুর মতো একজন পুরোপুরি মানবিক নেতার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক মেধা ছিল অবিশ্বাস্য। তাই ভারত পাকিস্তান দেশ ভাগের এক বছরের ভেতর তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য তিনি আন্দোলন করেছিলেন সেই রাষ্ট্রটি বাঙালিদের জন্য কোনো মঙ্গল বয়ে আনবে না। তিনি তার প্রমাণও চোখের সামনে দেখতে পেলেন। শুধু বঞ্চনা এবং শোষণ নয়, পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রটি বাঙালিদের নিজের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার অধিকারটুকুও দিতে রাজি নয়। রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন করে তিনি সেই ৪৮ সালে প্রথমবার জেলে গেলেন–তারপর কতবার জেলে গিয়েছিলেন মনে হয় তার কোনো হিসাব নেই! বঙ্গবন্ধু সঠিকভাবে বুঝেছিলেন বাঙালিদের দাবি আদায় করে নেবার জন্য দরকার একটি সুগঠিত শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। দল সংগঠিত করার জন্য তিনি মন্ত্রিত্ব পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে শুরু করে তিনি দেখতে দেখতে সত্যিকারের নেতা হয়ে উঠলেন। প্রথমে যুগ্মসম্পাদক, তারপর সাধারণ সম্পাদক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর সবশেষে সভাপতি। ১৯৫৮ সালে শুরু হলো আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, সারা দেশে রাজনৈতিক নেতাদের ওপর জেল-জুলুম, বঙ্গবন্ধু তার মাঝে তাঁর দলকে সংগঠিত করে চললেন।

বঙ্গবন্ধু আজীবন রাজনীতি করেছেন দেশের মানুষের জন্য, তাঁর স্বপ্ন ছিল বাঙালির স্বাধিকার। শক্তিশালী সুসংগঠিত একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতি হিসেবে তিনি বাঙালির স্বাধিকারের জন্য ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণা করলেন। ঘোষণা দিয়েই শেষ নয়, সারাদেশ ঘুরে ঘুরে তিনি ছয় দফার পক্ষে বিশাল জনমত গড়ে তুললেন। ছয় দফার সনদটি ছিল স্বাধিকারের মোড়কে ঢাকা স্বাধীনতার ডাক। দেশের মানুষ তাই ছয় দফাকে লুফে নিল, বঙ্গবন্ধুর পিছনে একতাবদ্ধ হতে শুরু করল প্রবল আগ্রহে। বিপদ টের পেয়ে আইয়ুব খানের সরকার শুধু বঙ্গবন্ধু নয়, তাঁর দলের ছোটো বড়ো সব নেতাকে জেলখানায় পুরে রাখল। শুধু তাই নয়, তাদের অস্তিত্বের জন্যে 'বিপজ্জনক' এই নেতাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা চাপিয়ে দেওয়া হলো।

দেশের সেই ক্রান্তিলগ্নে ১৯৬৯ সালে তখন ছাত্র সমাজ এগিয়ে এসেছিল, সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ তৈরি করে তারা সারাদেশব্যাপী একটি বিশাল গণআন্দোলন শুরু করে দেশকে উথাল-পাথাল করে দিলো। আইয়ুব খানের সরকার বাধ্য হলো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে। দেশের ছাত্র-জনতা তাদের নেতাকে ফিরে পেয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সের ময়দানে ১০ লক্ষ থেকে বেশি মানুষের সামনে তাঁকে প্রথমবার 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে সম্মানিত করে, সেই থেকে তিনি সবার কাছে বঙ্গবন্ধু হিসেবে পরিচিত।

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা দিয়ে আইয়ুব খান মাথা হেঁট করে চিরদিনের জন্য রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। পাকিস্তানের নতুন সামরিক সরকার নির্বাচনের ঘোষণা দিল। তাদের হিসাব ছিল খুব সহজ, তারা দেখে এসেছে রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে শুধু বিভেদ আর অনৈক্য, কাজেই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে কেউ সরকার গঠন করতে পারবে না, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় থেকে যাবে যতদিন তাদের ইচ্ছে।

তাদের হিসেবে অনেক বড়ো একটা ভুল ছিল, তারা বঙ্গবন্ধুর সত্যিকারের ক্ষমতা অনুমান করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের স্বাধিকারের স্বপ্ন দেখিয়ে একতাবদ্ধ করে রেখেছেন। তাই সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু দুইটি সিট ছাড়া বাকি সব সিট পেয়ে গেলেন। এখন তিনি শুধু বাঙালিদের নয়, পুরো পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা, এই প্রথমবার পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবে একজন বাঙালি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেটা কেমন করে মেনে নেবে? শুরু হয়ে গেলো কুটিল নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র। সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১ মার্চ হঠাৎ করে ইয়াহিয়া খান প্রস্তাবিত গণপরিষদ অধিবেশন স্থগিত করে দিলেন, খবরটা প্রচারিত হবার সাথে সাথে পুরোদেশ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ল, মুহূর্তের মাঝে ঢাকা নগরী হয়ে গেল মিছিলের নগরী!

পৃথিবীর মানুষ তখন অবাক হয়ে দেখল একজন মানুষ কেমন করে একটি দেশ হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর একটি তর্জনী হেলনে পুরো দেশ থমকে দাঁড়াল। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর অসহযোগ আন্দোলনে পুরোদেশ রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীনে নয় বঙ্গবন্ধুর মুখের কথায় পরিচালিত হতে লাগল। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ সেই সময়কার রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর জগৎ বিখ্যাত ভাষণ দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। যেটি ছিল স্বাধিকারের সংগ্রাম, সেই মুহূর্তে সেটি স্বাধীনতার সংগ্রামে পালটে গেল। তখনো কেউ জানতো না রক্ত যদি স্বাধীনতার মূল্য হয়ে থাকে তাহলে কতো মূল্য দিয়ে এই স্বাধীনতা কিনতে হবে।

পরের ইতিহাসটুকু আমরা সবাই জানি–সেটি ছিল আত্মত্যাগের ইতিহাস, বীরত্বের ইতিহাস এবং অর্জনের ইতিহাস। ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে মধ্যরাত থেকে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম গণহত্যা শুরু হয়ে গেল, গ্রেপ্তারের পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গেলেন। তাঁকে পাকিস্তানের একটি বন্দিশালায় বন্দি করে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হতে থাকে। পাকিস্তানের বন্দিশালায় বঙ্গবন্ধুর বিচার করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো, শঙ্কাহীন অবিচল বঙ্গবন্ধু তাঁর শেষ ইচ্ছাটি জানিয়ে দিলেন, মৃত্যুদণ্ডের পর তাঁর মৃতদেহটি যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

নয় মাসের যুদ্ধ শেষে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশের মাটিতে লাল সবুজ পতাকার বুকে সোনালি বাংলাদেশ আঁকা পতাকাটি উড়তে শুরু করে। সেই পতাকায় লাল সূর্যটি কত রক্ত দিয়ে আঁকা হয়েছে, কত অশ্রুতে সেটি সিক্ত রয়েছে তার ইতিহাস তখন পর্যন্ত জানে শুধু স্বজনহারা আপনজন। বিজয়ের পর সারা পৃথিবীর চাপে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। বঙ্গবন্ধু তাঁর দেশের মানুষের কাছে ফিরে এলেন জানুয়ারির ১০ তারিখে। মানুষের ভালোবাসার সেই স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশের মতো সেই অনুপম দৃশ্যটি এভাবে পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেছে বলে জানা নেই।

১৯৬৯ সালে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার স্পেশাল ট্রাইবুনালের পথে বঙ্গবন্ধু

দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু দেশ পুনর্গঠনে হাত দিলেন। দেশে তখন লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা মানুষ, পিতৃহারা পরিবার, সন্তানহারা মা, লাঞ্ছিতা নারী, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, হতদরিদ্র জনগণ। তাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, পরনে কাপড় নেই, মুখে খাবার নেই। দেশে রাস্তাঘাট নেই, সেতু নেই, যানবাহন নেই, স্কুল নেই, কলেজ নেই, লেখাপড়ার বই নেই, খাতা নেই। অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, শুধু মানুষের বুকে বিশাল একটা প্রত্যাশা। নুতন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র, বৈরী আবহাওয়া, দুর্ভিক্ষের প্রতিধ্বনি এরকম অসংখ্য প্রতিকূলতার মাঝখানে বঙ্গবন্ধু কাজ শুরু করলেন। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় এক বছরের ভেতর জাতিকে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান উপহার দিলেন। তিনি জানতেন দেশকে পুনর্গঠনের প্রথম ধাপ হচ্ছে শিক্ষার পুনর্গঠন, তাই দেশে ফিরে আসার সাত মাসের মাথায় তিনি একটি শিক্ষা কমিশন তৈরি করে তার দায়িত্ব দিলেন বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ কুদরাত-ই-খুদা-কে। তিনি শুধু মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলেননি, সেটি বাস্তবায়নের জন্য দেশকে উপহার দিলেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দিলেন, কৃষি উপকরণ সরবরাহ করার উদ্যোগ নিলেন, শিল্পের জাতীয়করণ করলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বাংলাদেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তার গ্যাস ফিল্ডগুলোর মালিকানা ছিল বিদেশি কোম্পানির। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের ৯ তারিখ সেগুলো কিনে নিল বাংলাদেশ সরকার।

সপ্তাহ না ঘুরতেই আগস্ট মাসের ১৫ তারিখ ভোরবেলা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম একটি হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করা হলো। দুধের শিশু থেকে নববিবাহিতা বধূ কিংবা অন্তঃসত্ত্বা নারীটিও রক্ষা পেল না। বঙ্গবন্ধুর রক্তে রঞ্জিত হলো এই অভাগা দেশের মাটি। যে দেশটির তিনি জন্ম দিয়ে গেছেন সেই দেশটিকে গড়ে তোলার সময়টুকুও তাঁকে দেওয়া হলো না।

তারপর কতদিন কেটে গেছে। বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু সমার্থক, তাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে আসলে বাংলাদেশকেই হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে গড়ে তোলা বাংলাদেশ তার পথ হারিয়ে বিভ্রান্তির কানা গলিতে হারিয়ে গেল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যে অপরাধ করা হয়েছিল তার থেকেও জঘন্য অপরাধ করতে এগিয়ে এল মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী যুদ্ধাপরাধীর আশীর্বাদপুষ্ট সরকার। তারা বাংলাদেশের মাটি থেকে বঙ্গবন্ধুর শেষ চিহ্নটিও মুছে ফেলতে চাইলো। এই দেশে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বড়ো হলো বঙ্গবন্ধুর কথা না জেনে, তাঁর ছবি না দেখে, কণ্ঠস্বর না শুনে। কেমন করে শুনবে? বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের সেই অগ্নিঝরা ভাষণ পর্যন্ত এই দেশে নিষিদ্ধ। কিন্তু যেই মানুষটি এই দেশের মানুষের হৃদয়ের গহীনে আশ্রয় নিয়ে আছেন, কোন পাপিষ্ঠ, কোন দুরাত্মার সাধ্য আছে তাঁকে সেখান থেকে অপসারণ করার?

তাই বঙ্গবন্ধু তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে ফিরে এসেছেন তাঁর পূর্ণ মহিমায়। যতদিন বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা আকাশে উড়বে ততদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকবেন আমাদের হৃদয়ের গভীরে। বাংলাদেশের আকাশে, বাতাসে, মাটিতে। বাংলাদেশের হৃদয়ের গভীরে।

লেখক: সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ❑

\\storage\Advertisement\2020\16.03.2020\Mujib 100\TAB_7

ডিএফপি নং ০৭-১৬/০৩/২০২০

\\storage\Advertisement\2020\16.03.2020\Mujib 100\TAB_8